SHUBHRA CHANDRA
DEPT. OF GEOGRAPHY
SEMESTER - VI
PAPER - C 13 T
EVOLUTION OF GEOGRAPHICAL THOUGHT
UNIT - I : NATURE OF PRE - MODERN GEOGRAPHY
(1.)

তবেই আমরা ভূগোলে গত কয়েক দশকে যেসব যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলি অনুধাবন করতে পারব।

2.2.1 ভূগোলের আদিকাল (The Ancient Period in Geography)

জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলির চেয়ে **ভূগোলের ইতিহাস প্রাচীন**। আদিমকাল থেকে মানুষ চেষ্টা করেছে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে বুঝতে। সম্ভবত এভাবেই ভৌগোলিক জ্ঞান আহরণের শুরু হয়েছিল। প্রকৃতিকে উত্তরোত্তর নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছে মানুষ, পরিবেশে ঘটিয়েছে নানা পরিবর্তন। ভূগোলের জ্ঞান ছাড়া এ সম্ভব ছিল না। আবার মানুষই একসময়ে প্রকৃতির সঙ্গে আপস করে চলার নীতিগুলি বুঝতে পেরেছে। এই সুদীর্ঘ সময়কালে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় ঃ মানুষ সর্বদাই **প্রকৃতির আপাত খেয়ালখুশির মধ্যে সুসঙ্গতি ও শৃঙ্খলা অনুভব করেছে**। এর থেকেই মানুষের মধ্যে **প্রাকৃতিক নিয়মকানুন** (natural laws) খোঁজার চেষ্টা এসেছে।

পৃথিবীর নানা অঞ্চলে **নদী উপত্যকাগুলিতে যেসব আদি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল** (যেমন টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, নীল, হোয়াংহো বা সিন্ধু) তাদের প্রতিটিই ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসারে প্রাথমিক অবদান রেখে গেছে কিছু না কিছু। ব্যাবিলনের নির্মেঘ আকাশ সাহায্য করেছে জ্যোতির্বিদ্যার গোড়াপত্তনে, নীলনদের উর্বর কৃষিসমভূমিতে গড়ে উঠেছে জ্যামিতিক জ্ঞান এবং গ্রীসের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিরূপ ও ভগ্ন তটরেখা সাহায্য করেছে প্রাকৃতিক ভূগোলের অনুসন্ধানকে। মধ্য এশিয়ার তুরস্ক, লেবানন, সিরিয়া ও ইসরায়েল অঞ্চলে ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসার ঘটে। ভারতীয় বেদ, রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণগুলিতে ভৌগোলিক জ্ঞানের উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। চীন দেশেও প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল।

2.2.2 গ্রীক যুগের ভূগোল (Greek Geography)

তবে পাশ্চাত্যে **গ্রীস দেশের পণ্ডিতেরা** প্রথম ভূগোলের ধ্যান ধারণাগুলি প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রীক পণ্ডিতদের প্রমাণিত তথ্যগুলি পরবর্তীকালেও বহুদিন প্রচলিত ছিল। বৈজ্ঞানিকভাবে ভূগোল পাঠের গোড়াপত্তন করেন গ্রীক পণ্ডিতেরাই। 'কসমস' (Cosmos) বা **পৃথিবীকে** তাঁরা দেখেন সুসম্বদ্ধভাবে সংযুক্ত অংশ নিয়ে তৈরি এক সামগ্রিক বিষয় হিসেবে (harmoniously related parts)। গ্রীক পণ্ডিতদের মতে এই পৃথিবীর থেকে পৃথক হল 'কেনোস' (Kenos) বা **শূন্য**।

গ্রীক পণ্ডিতদের ভৌগোলিক জ্ঞানের মূলে আছে **পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ ও সাধারণীকরণ** (observation, measurement and generalization) প্রক্রিয়াগুলি, যা প্রচলিত করেছিলেন তাঁদেরও আগে ইজিপ্ট এবং মেসোপটেমিয়ার দার্শনিকেরা। তবে ভূগোলের ধারণাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করার প্রাথমিক কৃতিত্ব **হেরোডোটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল ও এরাটোসথেনীস** প্রভৃতি পণ্ডিতদের। গ্রীসদেশের স্বর্ণযুগে ভৌগোলিক জ্ঞানের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। কানে শোনা গল্প ও উপকথার (myth)

Scanned with CamScanner

ওপরে বিশ্বাস না রেখে **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন গ্রীক দার্শনিকেরা,** এবং তাঁদের রেখে যাওয়া তথ্য পরবর্তীযুগের ভৌগোলিকদের প্রভাবিত করেছে।

গ্রীক পণ্ডিতদের লেখায় **প্রধানত দু'টি ধারা** লক্ষ্য করা যায় ঃ **সাহিত্যিক ঐতিহ্য** ও **গাণিতিক ঐতিহ্য** (literary tradition and mathematical tradition)। গ্রীক মহাকাব্য 'ওডিসি'-র রচয়িতা **হোমার** তাঁর রচনায় বিভিন্ন দিক থেকে আগত বায়ুপ্রবাহগুলির বর্ণনা দিয়েছেন খ্রিস্টজন্মের বহু আগে। গ্রীসের বন্দরগুলিতে জড়ো হত নানা দেশের ব্যবসায়ী ও নাবিকেরা। ফলে একদিকে ভৌগোলিক তথ্য একনাগাড়ে সরবরাহের সুবিধা হত, অন্যদিকে নানান সংস্কৃতির মানুষ তাদের বহুবিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালীকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগও পেত।

খ্রিস্টজন্মের ছয় বা সাত শতাব্দী পূর্বে **থেলেস** (Thales) জ্যামিতিচর্চার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত বিষয়সমূহের পরিমাপ ও অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হন। থেলেসই প্রথম পণ্ডিত যিনি পৃথিবীকে **জলে ভাসমান চাকতি** (disk) **আকৃতির বস্তু** বলে অনুমান করেন। তাঁর চেয়ে বয়সে সামান্য ছোট ছিলেন **অ্যানাক্সিম্যান্ডার** (Anaximander)।

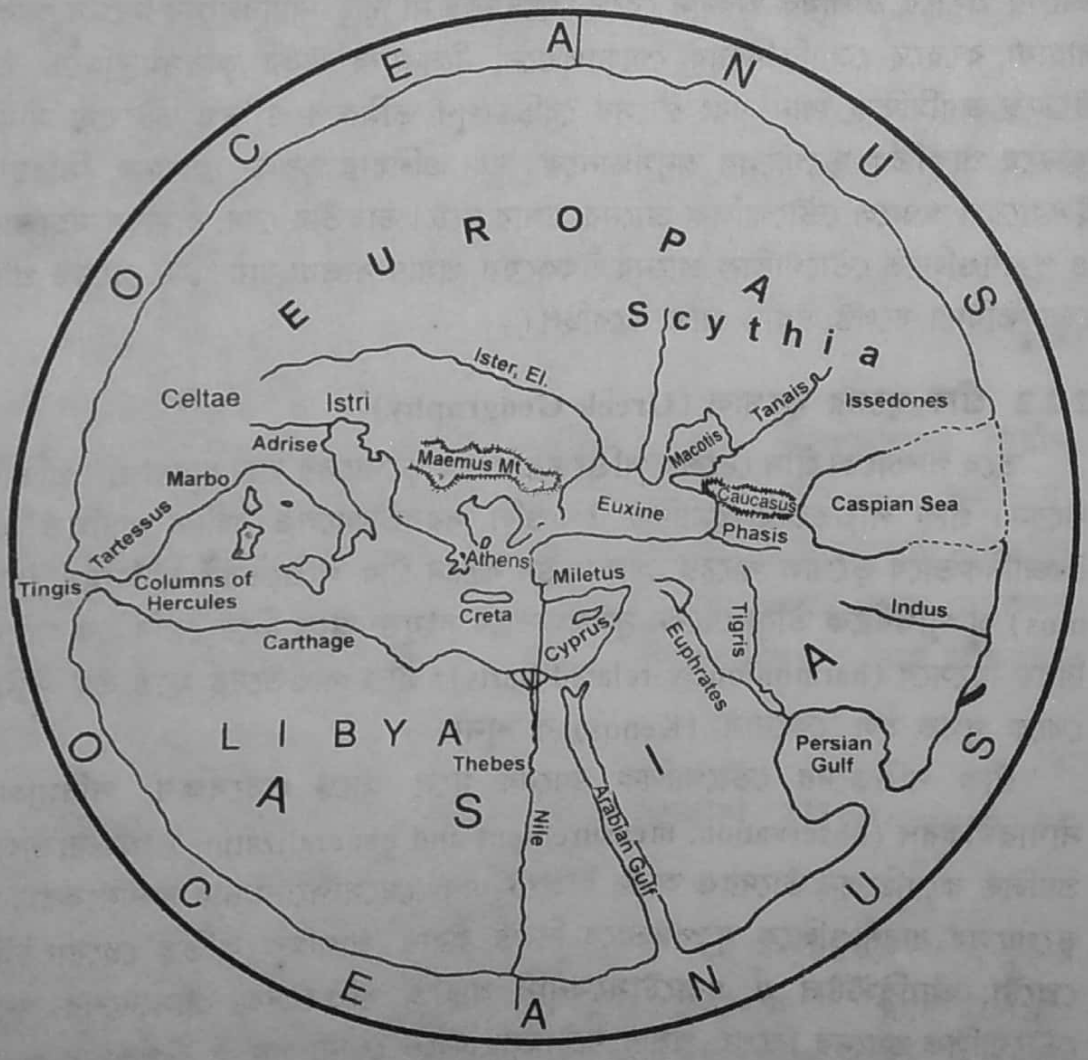

হেক্যাটিয়াসের পৃথিবী

Scanned with CamScanner

নোমোন (Gnomon) নামে লম্বালম্বিভাবে খাড়া করা একটি কাঠের দণ্ড তিনি ব্যাবিলন থেকে নিয়ে আসেন সূর্য-গ্রহ-তারা প্রভৃতির আপেক্ষিক অবস্থান পরিমাপের জন্য।

হেক্যাটিয়াস (Hecataeus)-এর জন্ম থেলেস ও অ্যানাক্সিম্যান্ডার-এর মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে, এবং তিনি নিজে মারা যান খ্রিস্টপূর্ব 475 সালে। ইতিমধ্যে তিনি গ্রীক ভাষায় গদ্যে গ্রীসদেশ ও অন্যান্য দূরবর্তী স্থান সম্পর্কে অনেক তথ্য লিখে রেখে যান। তাঁর লেখা বইটির নাম **গেসপেরিওডোস** (Gesperiodos) অর্থাৎ 'পৃথিবীর বর্ণনা' (description of the earth)। এই বইতে ভূমধ্যসাগর, দ্বীপসমূহ, প্রণালী ও নানা দেশের সীমানা বিবৃত করা হয়েছে। তবে এসব লেখার অধিকাংশ আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হেক্যাটিয়াসের এই বিপুল রচনাকর্মের জন্য তাঁকে 'ভূগোলের জনক' (father of geography) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে চ্যাপ্টা গোলাকার পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে গ্রীস।

হেরোডোটাস (Herodotus) জন্মান খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, এবং তাঁর অধিকাংশ রচনা এথেন্স-এ লেখা। 'ইতিহাসের জনক' (father of history) নামে তাঁর পরিচিতি সমধিক। পুরাতন দার্শনিকদের বক্তব্যগুলি ত্যাগ করে হেরোডোটাস সম্পূর্ণ **এক নতুন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপন করেন।** তাঁর মূল বক্তব্য ঃ ইতিহাসকে ভূগোলের দৃষ্টিবিন্দু থেকে বিচার করতে হবে এবং ভূগোলকেও ইতিহাসের দৃষ্টিবিন্দু অনুসরণ করতে হবে (all history must be treated geographically and all geography must be treated historically)। কৃষ্ণসাগর, রাশিয়ার স্তেপ তৃণভূমি এবং পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণের সময়ে তিনি **প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা** থেকে জ্ঞান লাভ করেন। এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি প্রায় সঠিক বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তবে নীল ও ইস্তার (Ister), যাকে আজকের দানিয়ুব মনে করা হয়, নদী দুটির উৎস সম্পর্কে হেরোডোটাস-এর অনুমান ভ্রান্ত ছিল। ইউরোপ মহাদেশ উত্তরে কতখানি বিস্তৃত এ-নিয়েও তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। তবে **প্রথম দ্রাঘিমারেখা** আঁকার কৃতিত্ব তাঁরই। কাস্পিয়ান সাগরকেও তিনি চতুর্দিকে মহাদেশীয় ভূখণ্ড দিয়ে ঘেরা বলে সিদ্ধান্ত করেন। **হেরোডোটাস** প্রথম প্রমাণ করেন যে নীল নদের উপত্যকা, বিশেষ করে তার বদ্বীপ অংশটি নদীবাহিত পলি দিয়ে গঠিত হয়েছে। পুরাতন মানচিত্রের সাহায্যে তিনি দেখান যে ক্রমাগত বদ্বীপ গঠনের ফলে অনেক প্রাচীন বন্দর দেশের ভেতরে চলে এসেছে। ইউরোপ, এশিয়া ও লিবিয়া (আফ্রিকা)—এই তিনটি মহাদেশকেও তিনিই পৃথকভাবে চিহ্নিত করেন, যদিও তাঁর ইউরোপের আয়তন ছিল এশিয়া ও লিবিয়ার (আফ্রিকার) মিলিত আয়তনের সমান।

কোথাও সঠিক, কোথাও ভুল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিংবা অনুমানের মাধ্যমে পৃথিবী ও পরিবেশ, নতুন নতুন দেশ ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এই যে কষ্টকর ও সুদীর্ঘ পথ এর মধ্য দিয়েই **প্লেটো** (Plato) প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকেরা ভৌগোলিক জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারে প্রয়াসী হন। প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পান কার্যকারণ-সম্বন্ধ (cause and effect relationship)। প্লেটোর (খ্রিস্টপূর্ব

Scanned with CamScanner

428-348 সাল) মূল বক্তব্য হল **পৃথিবী সৃষ্টির সময়কার চরমোৎকর্ষ** (perfection) **ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে**। তাঁর মতে আমাদের চারপাশে যা কিছু আমরা দেখতে পাই, তা সবই এই আদর্শের হাস্যকর অনুকরণ। তাঁর **দি রিপাবলিক** (The Republic) বইটিতে **প্রাচীন গ্রীসের প্রথম কল্পলোক** (Utopia) রচনা করেছেন প্লেটো। এই কল্পরাজ্যের আদর্শ জনসমষ্টির বর্ণনা করতে গিয়ে প্লেটো শুরু করেছেন একেবারে এর প্রাকৃতিক ভিত্তিভূমি থেকে। ভৌগোলিক দিক থেকে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র হল একটি শহর, চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, সমুদ্রের কাছে। শহরের বাইরে চারপাশে অনেকটা চাষের জমি যেখান থেকে শহরের লোকেদের খাদ্যের যোগান আসে। এ-ধরনের আদর্শ কল্পরাজ্যে বাস করবে তিনশ্রেণীর পুরুষ ও নারীঃ **অভিভাবক শ্রেণী** যারা শাসন করবে, **যোদ্ধাশ্রেণী** যারা বাইরের আক্রমণ থেকে শহরকে রক্ষা করবে, এবং **শ্রমজীবী জনসাধারণ** যারা গৃহ নির্মাণ ও খাদ্য উৎপাদন করবে। তাঁর এই **অভিজাত সাম্যবাদে** শ্রমজীবী গোষ্ঠীকে শহর রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে দূরে রেখেছিলেন বলে প্লেটো পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের দ্বারা যথেষ্ট সমালোচিত হন।

প্লেটোর শিষ্য **অ্যারিস্টটল** (Aristotle) খ্রিস্টপূর্ব 384 থেকে 322 সালের মধ্যে তৎকালীন ভূগোল-চিন্তনে বিপুল প্রভাব রাখেন। তাঁর মতে পৃথিবীতে **সবকিছু প্রতিনিয়ত আদর্শ অবস্থায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছে**। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেছেন যিনি, তাঁর মনে সৃজনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিকল্পিত চিত্র আগে থেকে ছিল। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিষয়সমূহ এক আদর্শ অবস্থায় পৌঁছাবে শেষ পর্যন্ত। দার্শনিকেরা এই বক্তব্যকেই **পরমকারণবাদ** (teleology) বলেন। বহু শতাব্দী পরে জার্মান ভৌগোলিক কার্ল রিটার (Carl Ritter) এই মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অ্যারিস্টটলের মতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন **যুক্তির ব্যবহার** (the use of logic)। **অক্ষাংশগত অবস্থানের তারতম্যে** ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ যে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী বা অনুপযোগী হতে পারে এই বক্তব্যও তাঁরই। অ্যারিস্টটলের এই আরোহী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণীকরণের ধারণার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর ছাত্র **অ্যালেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট** (Alexander the Great)।

হিপোক্রেটাস (Hippocratus) এই সময়ের অন্যতম প্রধান গ্রীক পণ্ডিত। তাঁর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদের জাতীয় চরিত্রের নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে।

এরাটোসথেনীস (Eratosthenes)-এর অসংখ্য রচনাকর্মের প্রায় সমস্তই আজ বিলুপ্ত। খ্রিস্টপূর্ব 276 সালে তিনি গ্রীক উপনিবেশ সাইরীন (Cyrene)-এ জন্মলাভ করেন এবং এথেন্সে শিক্ষা অর্জনের পর অ্যালেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তাঁর মতে পৃথিবী গোলকের ন্যায়, এবং অঙ্কের সাহায্যে নিরক্ষরেখার দৈর্ঘ্য ও পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করা সম্ভব। তিনি পৃথিবী থেকে সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্বও পরিমাপ করার চেষ্টা করেছিলেন। এসব কারণে তাঁকে ভূ-আকৃতিবিদ্যার (geodesy) জনক বলা হয়। এরাটোসথেনীস তাঁর রচিত বইটিতে **একুমেন** বা 'মনুষ্য বাসোপযোগী পৃথিবী'

Scanned with CamScanner

(ekumene—the habitable part of the earth)-এর বর্ণনা দিয়েছেন। উত্তরে প্রায় উত্তরমেরুবৃত্ত থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের শ্রীলঙ্কা, এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত তাঁর 'একুমেন' বিস্তৃত। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা দ্বারা বৈজ্ঞানিকভাবে অবস্থান নির্ণয় করে তিনি পূর্ববর্তী অবৈজ্ঞানিক রচনাগুলিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন।

হিপারকাস (Hipparchus)-এর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ পাওয়া না গেলেও এটুকু বলা যায় যে তিনি 140 খ্রিস্টপূর্ব অব্দে অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। মূলত জ্যোতির্বিদ হলেও তিনিই প্রথম অক্ষরেখার ভিত্তিতে পৃথিবীকে কয়েকটি জলবায়ু অঞ্চলে (climata) বিভক্ত করেছিলেন। গোলকের ন্যায় পৃথিবীকে সমতল কাগজের ওপরে আঁকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডিত্যের বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে **পসাইডনিয়াস** (Poseidonius)-এর উল্লেখ না করলে। পৃথিবীর পরিধি অঙ্ক কষে দেখানো থেকে শুরু করে নিরক্ষীয় অঞ্চলগুলির উচ্চ তাপমাত্রা—এগুলি ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু।

সাধারণভাবে গ্রীক পণ্ডিতদের অবদান সম্পর্কে বলতে হলে মনে রাখতে হবে **গাণিতিক ভূগোল ও প্রাকৃতিক ভূগোলে** এঁদের দক্ষতা ছিল সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীকে **মূল তিনটি জলবায়ু অঞ্চলে**—উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ ও শীতল (torrid, temperate and frigid)—ভাগ করার গ্রীক ঐতিহ্য আজও রয়েছে।

2.2.3 রোমান যুগের ভূগোল (Roman Geography)

গ্রীকদের পরে ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন রোমক বা রোমানরা। রোমের সুশৃঙ্খল সৈন্যদল মধ্য ইউরোপ, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও পশ্চিম এশিয়ার প্রান্তভাগে (এশিয়া মাইনর) ছড়িয়ে পড়ে। সুবিস্তৃত রোমান সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ফলে জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চা প্রসারিত হতে থাকে।

ভূগোলে রোমান পণ্ডিতদের অবদান প্রধানত ঐতিহাসিক ও আঞ্চলিক শাখা দুটিতে। তবে বেশির ভাগ রোমান পুঁথিপুস্তক প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিঁকে আছে **স্ট্র্যাবো** (Strabo)-র 'জিওগ্রাফিয়া' (Geographia) নামে বইটি। গ্রীক পণ্ডিতদের ভূগোলে অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে রোমানদের ভূগোলচর্চাকে বিচার করলে সাড়া জাগানোর মতো **নতুন বক্তব্য তেমন কিছুই পাওয়া যায় না।** অধিকাংশ রোমান পণ্ডিত গ্রীক ঐতিহ্য অনুসরণ করে ভৌগোলিক অনুসন্ধান করেছেন।

স্ট্র্যাবো-র জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব 64 অব্দে, তুরস্কের কৃষ্ণসাগর উপকূলে। তাঁর যুগে স্ট্র্যাবো ছিলেন অন্যতম প্রধান পণ্ডিত। স্ট্র্যাবোর শিক্ষায় হোমার, হেক্যাটিয়াস এবং সম্ভবত অ্যারিস্টটল প্রভৃতি **গ্রীক পণ্ডিতদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর।** অনুমান করা হয় যে গ্রীকদের চালু করা ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে শেষ অবধি প্রতিষ্ঠিত করেন স্ট্র্যাবো। অথচ গ্রীক পণ্ডিত হেরোডোটাসকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন 'গল্পের দোকানদার' (retailer of fiction)। তাঁর লেখা ভৌগোলিক বিবরণগুলির শুরুতেই স্ট্র্যাবো প্রতিটি দেশের

Scanned with CamScanner

মত দ্বিধাবিভক্ত ঃ একদল তাঁকে মনে করেন 'জিনিয়াস' যাঁর লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল আবিষ্কারের মহান যুগের পর্যটকেরা (Explorers of the Great Age of Discovery); অন্যদলের মতে তিনি অনুকরণকার (plagiarist) যিনি তাঁর পূর্বসূরী হিপারকাস ও পসাইডোনিয়াস প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতদের লব্ধ জ্যোতির্বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিকভাবে গুছিয়ে পেশ করেছিলেন মাত্র। পৃথিবীর পরিধি ও পূর্বদিকে মহাদেশগুলির বিস্তৃতি সম্পর্কে টলেমির অনুমান অবশ্য ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর লেখা আটটি বই-এর মধ্যে মানচিত্র প্রস্তুত ও গোলাকৃতি পৃথিবীকে 360টি অংশে ভাগ করে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা দ্বারা ভূপৃষ্ঠের যে কোনও অংশের সঠিক অবস্থান নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। টলেমির লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'অ্যালমাগাস্ট' (Almagast) এবং 'দি আউটলাইন অফ জিওগ্রাফি' (The Outline of Geography) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে টলেমিই **প্রথম বঙ্গোপসাগর** (তাঁর ভাষায় Gangetic Gulf) **মানচিত্রে দেখান। গঙ্গা নদীর উৎস** যে হিমালয় পর্বতে, তাও তিনি দেখাতে সক্ষম হন। তবে তাঁর মতে এশিয়ার ভূখণ্ড পূর্বদিকে আফ্রিকার উপকূলের সঙ্গে একটানাভাবে সংযুক্ত। কিন্তু পশ্চিম এশিয়া, বিশেষত আরব উপদ্বীপ (Arabia Felix–Peninsula of Arabia) সম্পর্কে তাঁর বিবরণগুলি অন্যদের চেয়ে বহুগুণে উন্নত। নীল নদের উৎস সম্পর্কে তাঁর মতামতও বহুলাংশে সঠিক। সুতরাং ভুল-ভ্রান্তি থাকলেও মনে রাখতে হবে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকভাবে রচিত তাঁর মানচিত্রগুলির মূল্য কম নয়। তাঁর চেষ্টাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, এবং অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ—তাঁর রচনার তেরশো ও ষোলশো বছর পরে।

জেমস ও মার্টিনের (James and Martin, 1981) মতে **টলেমির** মৃত্যুর পরে গ্রীক পণ্ডিতদের দ্বারা উন্মোচিত ভূগোলের দিগন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠকে মানুষের আবাসস্থল হিসাবে গণ্য করে তাকে নিয়ে গবেষণা নতুন করে শুরু হয় আরও বহু শতাব্দী গত হবার পর। রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙনের ছায়া তৎকালীন সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ভূপর্যটন-প্রচেষ্টাগুলিতেও পড়েছিল।

2.2.4 চীন দেশে ভূগোলের আদিযুগ (Ancient Geography in China)

ভূগোলের নিয়মকানুন সম্পর্কে ধারণাগুলি যখন গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদের অবদানের ফলে ইউরোপে গড়ে উঠছে, তখন ভূগোলের উল্লেখযোগ্য চর্চা চলেছে এশিয়ার অন্য এক প্রান্তে, চীনদেশে। আশ্চর্যের বিষয় হল গ্রীক ও চীনা পণ্ডিতদের সুউন্নত মানসজগৎ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বহুযুগ; একে অপরকে জানতে বহু সময় লেগেছে এবং তাও সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র ধাপে ধাপে। তা সত্ত্বেও এই দুই দেশের পণ্ডিতদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ মিল দেখা যায়।

চীনদেশের ভূগোলচর্চা প্রধানত **তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা** (establishment of theories) ও **সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করার পদ্ধতি** উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগী ছিল। চীনের

Scanned with CamScanner

গণিতজ্ঞরা **শূন্যের ব্যবহার** এবং **দশমিক পদ্ধতি** প্রচলিত করেন। ইউরোপে এধরনের উন্নত গাণিতিক নিয়ম এসে পৌঁছায় হিন্দুদের মাধ্যমে, বাগদাদ হয়ে, 800 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ।

চীনা পণ্ডিতদের চিন্তাজগতে মানুষকে কখনও প্রকৃতি থেকে আলাদা করে দেখা হয়নি। তাঁরা মনে করতেন **মানুষ প্রকৃতিরই অংশ।** এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরমকারণবাদের (teleological) অনুপস্থিতি। ফলে চীনা ভৌগোলিকেরা পরমক্ষমতাময় ঈশ্বরের সৃষ্ট এই পৃথিবী, এভাবে না ভেবে **চোখে দেখা যায় এমন বিষয় ও প্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।** খ্রিস্ট জন্মের সম্ভবত তেরশো বছর আগে তাঁরা **আবহাওয়ার** খবর দিয়েছেন খাঁটি তথ্যের ওপরে ভিত্তি করে।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা হয়েছে তখনকার চীনের **নয়টি প্রদেশে লব্ধ উপকরণের বিবরণ** ঃ মৃত্তিকার প্রকৃতি, উৎপন্ন দ্রব্যের ধরন এবং জলপথে পরিবহণের বন্দোবস্ত। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে **জলচক্র** (hydological cycle) সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়েছে চীনা পণ্ডিতদের। প্লেটোর সমসাময়িক চীনা দার্শনিক **মেং জু** (Meng-tzu) ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন নির্বিচারে **অরণ্য ধ্বংসের ফলাফল** সম্পর্কে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনা ইঞ্জিনীয়াররা **নদীতে পলির পরিমাণ মাপার সুনির্দিষ্ট উপায়** উদ্ভাবন করেছেন। এছাড়া কাগজ আবিষ্কার, বই ছাপানোর পদ্ধতি, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপার যন্ত্র (rain gauge), এবং সমুদ্রে ব্যবহারের উপযোগী চৌম্বকীয় কম্পাস উদ্ভাবন হয়েছে চীন দেশে এই সময়ে। মানচিত্র রচয়িতা **ফেই সিউ** (Phei Hsiu) 267 খ্রিস্টাব্দে চীনদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রস্তুত করেন। এই মানচিত্র প্রস্তুতে তিনি চৌখুপী (grid) পদ্ধতির সাহায্য নেন। হোমারের 'ওডিসি'-র সমতুল্য ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রথিত আছে **সম্রাট মু**-এর ভ্রমণকাহিনীগুলিতে (The Travels of Emperor Mu)। মধ্য এশিয়া দিয়ে বুখারা, পারস্য দেশ ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে পৌঁছবার পথ এই গ্রন্থে বর্ণনা করা আছে। এই পথ ধরে বণিকেরা নিয়মিত পণ্য আদান-প্রদান করত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রীকদের মতো চীনা ভৌগোলিকদের লেখাতেও **দুটি সুস্পষ্ট ধারা** লক্ষ্য করা যায় ঃ **সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং গাণিতিক ঐতিহ্য**

মিল ও পার্থক্য

ঐশ্বরিক সৃষ্টিবাদের ওপরে নির্ভর না করে চীনা দার্শনিকেরা **যান্ত্রিক-ভাবে পার্থিব রহস্যগুলির ব্যাখ্যা খুঁজেছেন,** গ্রীক ও চীনা পণ্ডিতদের ভূগোলচর্চার এটিই সবচেয়ে বড় পার্থক্য।

2.2.5 ভারতে ভূগোলের আদিযুগ (Ancient Geography in India)

ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টিকাল থেকে ভৌগোলিক ধ্যানধারণাগুলি গড়ে উঠেছে। হিন্দু দর্শন, মহাকাব্য, ইতিহাস ও পুরাণগুলির মধ্যে ভৌগোলিক তথ্য ও ব্যাখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। কালক্রম অনুসারে **বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থাবলী,**

Scanned with CamScanner

এবং পুরাণসমূহ হল আদিকালের ভারতীয় ভূগোলচিন্তার উৎস। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতীয় ভূগোলের উৎপত্তির যুগে **ধর্ম** একটি **প্রধান ভূমিকা** পালন করেছে।

ধর্মীয় গ্রন্থাবলী ছাড়া **পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি** থেকেও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রতিবেশী ভূমিখণ্ডগুলির সঙ্গে ভারতের নিবিড় সম্বন্ধ এগুলি থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চীন, মেসোপটেমিয়া ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অংশে পণ্ডিতেরা যে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করতেন, ভারতে তা অজানা ছিল না।

ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থগুলিতে মহাদেশগুলি এক একটি 'দ্বীপ' নামে পরিচিত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা এসকল ভূমিখণ্ডের পর্বতমালা, নদনদীসমূহ, প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। **বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, ভট্টিল, উৎপল, বিজয়নন্দী** এবং অন্যান্যরা জ্যোতির্বিদ্যা, গাণিতিক ভূগোল এবং মানচিত্র অঙ্কনে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

'ভূগোল' শব্দটি ভারতে প্রথম ব্যবহার করেন **সূর্যসিদ্ধান্ত**। প্রাচীন পুরাণে ভূগোলকে **খগোল** (মহাকাশবিজ্ঞান) এবং **জ্যোতিষশাস্ত্র** থেকে আলাদাভাবে বিচার করা হয়েছিল।

বিশ্বজগৎ ও তার সৃষ্টি নিয়ে **বেদ ও পুরাণে** ভারতীয় পণ্ডিতেরা নানা চিন্তাভাবনার প্রমাণ রেখেছেন। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণে পৃথিবীকে **'ব্রহ্মাণ্ড'** হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পৃথিবী, এরকম অনুমান করা হত। **পুরাণে নয়টি গ্রহকে চিহ্নিত করা হয়েছিল ঃ** সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। ভারতীয় পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে গোলাকৃতি বলেই মনে করতেন, এবং সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ বিষয়েও তাঁরা অবহিত ছিলেন। পৃথিবীর আয়তন ও পরিধি বিষয়ে তাঁদের গণনাও প্রায় সঠিক ছিল। **অক্ষাংশ ও দেশান্তর** (দ্রাঘিমারেখা) -এর ব্যবহারও তাঁদের প্রায় নির্ভুল ছিল। লঙ্কা (শ্রীলঙ্কা)-র অবস্থান তাঁরা দেখিয়েছেন নিরক্ষরেখার ওপরে এবং **উত্তর মেরুতে মেরুপর্বতের** অবস্থান নির্ণয় করেছেন। উত্তর মেরুর উল্টোদিকে **দক্ষিণ মেরুকে বাড়বানল** নামে চিহ্নিত করেন প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা।

ঋক্‌বেদের মুনিঋষিরা **চারিটি দিকনির্ণয়** করে তাদের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ নামে চিহ্নিত করেন। এছাড়া দক্ষিণপূর্বকে আগ্নেয়, দক্ষিণপশ্চিমকে নৈর্ঋত, উত্তরপশ্চিমকে বায়ব্য, এবং উত্তরপূর্বকে ঈশান রূপে নির্ধারণ করা হয়। এর সঙ্গে ঊর্ধ্ব ও অধঃ, অর্থাৎ উপর ও নীচ, দিক দুটিও যুক্ত করে দশটি রূপে নির্দেশ করেন প্রাচীন পণ্ডিতেরা।

দিগ্‌নির্ণয় ছাড়াও **স্থানীয় সময়ের পার্থক্য** নির্ভুলভাবে গণনা করার পদ্ধতি প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। পুরাণে **ভূকম্প** এবং **জ্বালামুখী** শব্দদুটির ব্যবহার আছে। এছাড়া কঠিন শিলা, কর্দমাক্ত ভূমি এবং বালুকাময় অঞ্চল প্রভৃতির তারতম্যও প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন পণ্ডিতদের মতে **বায়বীয় অবস্থা থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি** হয়েছে। তাঁরা মনে করতেন পৃথিবীকে ঘিরে আছে **অন্তরীক্ষ**; ভাস্করাচার্যের মতে এর গভীরতা দ্বাদশ যোজন (অর্থাৎ 154 কিলোমিটার)। বায়ু দিয়ে গঠিত এই

Scanned with CamScanner

অন্তরীক্ষে বায়ুপ্রবাহ, মেঘ, বজ্রপাত, বৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতি বিষয় ঘটে। **ঋক্‌বেদে পাঁচটি ঋতুর** উল্লেখ আছে; অবশ্য বাল্মীকির রামায়ণে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বা শিশির, এবং বসন্ত এই **ছয়টি ঋতুর** নাম আছে।

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানে দিগ্‌নির্ণয় পদ্ধতি

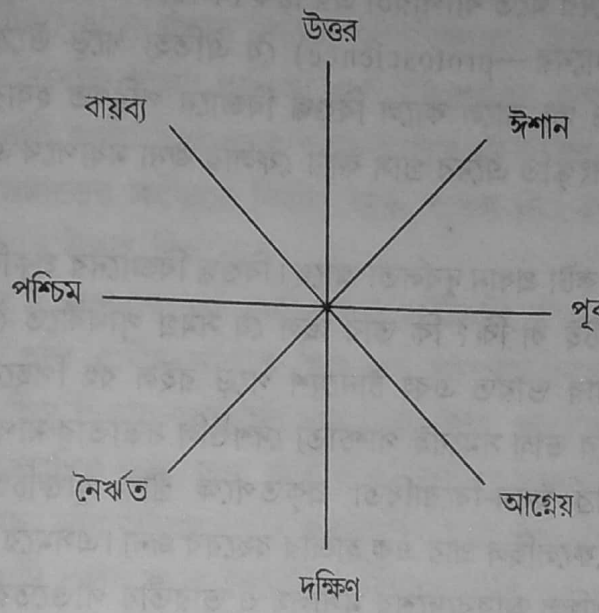

প্রাচীন ভারতীয় পুরাণে **সাতটি দ্বীপের** (বা ভূখণ্ডের) উল্লেখ আছে ঃ জম্বু, কুশ, প্লাসকা, পুষ্কর, শাল্মল, ক্রৌঞ্চ এবং শক দ্বীপ। এগুলির মধ্যে জম্বু দ্বীপ রয়েছে কেন্দ্রস্থলে, তাকে ঘিরে বাকি ভূখণ্ডগুলি রয়েছে। ভারতবর্ষ বা ভারত উপমহাদেশ জম্বু দ্বীপেরই অন্তর্গত।

ভারতবর্ষের ভূগোল সম্পর্কেও প্রাচীন জ্ঞান যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি **বর্ণে বিভক্ত ছিল এখানকার জনগোষ্ঠী**। প্রতিটি বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কর্ম ও সামাজিক স্থান। সেই অনুযায়ী প্রাচীন জনপদগুলিতে **গোষ্ঠীগুলির** বাসস্থানও নির্দিষ্ট হত। ভারতবর্ষের **পর্বত** ও **নদনদীগুলির** অবস্থান, উৎপত্তি ও গতিপথ সম্পর্কেও সম্যক ধারণা প্রাচীনকালে গড়ে উঠেছিল। এমনকি হিমালয়ের বিভিন্ন অংশকে **অন্তরগিরি** ও **বাহিরগিরি** বলে মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বঘাট পর্বতকে **মহেন্দ্রগিরি** আখ্যা দেওয়া হয়েছে। গঙ্গা ছাড়াও লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র), সিন্ধু, নর্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি নদীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে।

2.2.6 বিজ্ঞান ও ভূগোল ঃ প্রাচীন ভারত, চীন ও ইউরোপ

প্রাথমিক উন্নতি সত্ত্বেও ভারত ও চীন কেন পিছিয়ে পড়ল?

বিজ্ঞানের উন্নতির ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দু'টি বিষয়ে সকলেই একমত হন। **প্রথমত**, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে কোপারনিকাস, গ্যালিলেও, ও নিউটনের গবেষণাগুলির

Scanned with CamScanner

SHUBHRA CHANDRA
DEPT. OF GEOGRAPHY
SEMESTER - VI
PAPER - C13T
EVOLUTION OF GEOGRAPHICAL THOUGHT
UNIT - I: NATURE OF PRE-MODERN GEOGRAPHY
(3.) AGE OF 'DISCOVERY' AND 'EXPLORATION'

2.4 আবিষ্কারের যুগ এবং ভূগোলে তার প্রভাব (The Great Age of Discoveries and its Impact on Geography)

মধ্যযুগের গোড়ার দিকে খ্রিস্টীয় তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিবর্তে প্রাধান্য ছিল জনপ্রিয় কল্পকথার। এসব কাহিনী শুনে চমৎকৃত হওয়া যায়, কিন্তু মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে এগুলি প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে। এসব কল্পনামিশ্রিত বৃত্তান্তে প্রতিফলিত হয় **প্রকৃতি সম্পর্কে ভীতি ও অজ্ঞতা**, যা ছিল মধ্যযুগের আদিকালের বিচ্ছিন্নতা, দারিদ্র্য ও বর্বরতার মূল কারণ।

ধর্মযুদ্ধের যুগে ইউরোপের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক বিস্তারের সামনে ইসলাম যেন এক সুবিশাল বাধার প্রাচীর হিসাবে দাঁড়িয়ে ছিল। এই প্রাচীরের পূর্বদিকে যেটুকু অংশ ইউরোপে উঁকি দিতে পেরেছিল, তাতেই তার চোখে প্রাচ্যের, বিশেষত ভারতের সমৃদ্ধি ধরা পড়েছিল। ইউরোপ কখনও এই বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিল না; প্রাচীন রোম চিরকাল এই ধনসম্পদ যাঞ্ঞা করে এসেছে, একথা তারা সহজে ভুলে যায়নি।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী, অর্থাৎ পর্তুগীজদের উদ্যোগে আবিষ্কারের যুগের সূচনা পর্যন্ত ইউরোপীয়রা প্রাচীন স্থলপথগুলি ধরে এগিয়ে যাবার চেষ্টা চালিয়েছে। উপর্যুপরি ধর্মযুদ্ধগুলি রাজনৈতিকভাবে ইউরোপকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। তবু মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপে নতুন করে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শিখা; বাণিজ্যিক, সামরিক ও উপনিবেশ স্থাপনের এক উচ্চাশা। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, ইউরোপীয় জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের বিস্তারের জন্য প্রাচ্য বিজয় একান্তই অপরিহার্য ছিল।

আফ্রিকার তটরেখা বরাবর প্রাচ্যে পৌঁছাবার এক নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করতে পারলে শুধু যে অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী হওয়া যাবে তা নয়, সেই সঙ্গে পুরাতন শত্রুদের দুর্বল স্থানে আঘাত করা যাবে, এবং উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিপুল নতুন ভূখণ্ডের অধিকারী হওয়া যাবে।

মধ্যযুগের শেষভাগে এই উদ্দেশ্যটুকু সমাধা করতে তার আগের বহু কালের প্রচেষ্টা দায়ী। বেশ কয়েকটি সামুদ্রিক অভিযানে সফল হবার পরে পর্তুগীজ নাবিকেরা এশিয়ার বিপুল সম্পদ সংগ্রহে ব্রতী হয়। খ্রিস্ট পরবর্তী প্রথম শতাব্দী থেকেই শিক্ষিত ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা 'পৃথিবী গোলাকার'—এই প্রাচীন সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলে মেনে এসেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হল আফ্রিকার তটরেখা পরিক্রমায় সাফল্য। এই দুই-এরই ফলস্বরূপ **কলম্বাসের** সার্থক অভিযান।

Scanned with CamScanner

সাধারণত মনে করা হয় যে কলম্বাস কোনও এক 'অজানা মহাদেশের' সন্ধানে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। বরং প্রিন্স হেনরি ও তাঁর পরবর্তী নাবিকদের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের আবিষ্কারলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সর্বাপেক্ষা সহজতম ও দ্রুততম পথে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছানোই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

বার্থোলোমিউ দিয়াজ (Bartholomew Dias) 1486-'87-র মধ্যে 'ঝঞ্ঝা অন্তরীপে' (Cape of Agulhas) পৌঁছান। এরপরে 1492 সালে কলম্বাস ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন। অবশ্য তাঁর আর ভারতে পৌঁছানো হয়নি, পথিমধ্যে তিনি আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল এই নতুন মহাদেশের বিপুল সম্ভাবনা, এবং ফলস্বরূপ কলম্বাসের ভারত অন্বেষণ সেখানেই কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কলম্বাসের এই অভিযান সমস্ত মানবজাতির ইতিহাসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ চিহ্নিত করে। 'নতুন বিশ্বের' আবিষ্কার শুধু নয়, আটলান্টিকের সমুদ্রস্রোত ও বায়ুপ্রবাহগুলি সম্পর্কে তিনি প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন।

1497 থেকে 1499 সালের মধ্যে **ভাসকো ডা গামা** (Vasco da Gama) আরব সাগর অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতে মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান। 1510 খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজেরা কঙ্কণ উপকূলের গোয়া দখল করে। তার পরের বছর, অর্থাৎ 1511 খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজেরা মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার মাঝামাঝি মালাক্কাতে ঘাঁটি তৈরি করে। 1590 খ্রিস্টাব্দে তাইওয়ানে পৌঁছায় এবং সেখানকার নতুন পর্তুগীজ নামকরণ হয় ফরমোসা। এসব সমুদ্রাভিযানের মাধ্যমে পূর্ববর্তী গ্রীক ভৌগোলিকদের তৈরি অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে এবং প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হতে থাকে। কলম্বাসের মধ্যস্থতায় স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে 1494 সালে সম্পন্ন হয়েছিল **টরডেসিলের চুক্তি** (The Treaty of Tordessilles)। এই দুটি দেশ এই চুক্তির মাধ্যমে নবআবিষ্কৃত ভূমিখণ্ডগুলির মালিকানা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালের 'নতুন বিশ্বে' (New World) ভূমি-বিভাজনের (land-division) মধ্যে যে সঙ্গতি ও চৌখুপী (grid-iron) ধারা লক্ষ্য করা যায়, এই চুক্তি দিয়েই তার শুরু।

ফারনাও দ্য ম্যাগেলহেস (Fernao de Magalhaes) অধিক পরিচিত **ম্যাগেলান** (Magellan) নামে। এই পর্তুগীজ নাবিক 1518 সাল থেকে পশ্চিমদিকে সমুদ্রযাত্রা করে ব্রাজিলের উপকূল ধরে বহুদিন ভাসার পরে 1520 সালে দক্ষিণ আমেরিকার একটি প্রণালী খুঁজে পান। এই প্রণালীর মাধ্যমে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। তাঁর নামে এর নামকরণ হয় 'ম্যাগেলান প্রণালী'। 360 মাইল দীর্ঘ এই প্রণালী পার হতে তাঁর প্রায় এক মাস সময় লেগেছিল। এরপরে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করে 1521 সালে তিনি পৌঁছান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। এর আগেই তিনি পর্তুগাল থেকে পূর্বদিকে সমুদ্রযাত্রা করে ফিলিপাইনের পূর্বদিকে অবস্থিত মোলাক্কা দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছেছিলেন। ফলে ম্যাগেলানই প্রথম ব্যক্তি যিনি **জলপথে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ** (sail around the world) করতে সক্ষম হলেন।

'পৃথিবী গোল'. এই সত্য কলম্বাস অনুমান করেছিলেন, ম্যাগেলান তাকে **প্রমাণ করলেন।**

Scanned with CamScanner

এর আগে 1500 সালে পর্তুগীজ নাবিক **ক্যাবরাল** (Cabral) পৌঁছেছিলেন ব্রাজিলের উপকূলে এবং 1502 সালে সেখানে গড়ে উঠেছিল প্রথম পর্তুগীজ ঘাঁটি।

এসব সমুদ্রাভিযানের সাফল্যের মাধ্যমে সূচিত হল **আবিষ্কারের মহান যুগ** (The Great Age of Discovery), যা পরবর্তীকালে বাণিজ্যবিপ্লব (1500-1750) ও শেষ অবধি শিল্পবিপ্লবের (1760-1840) মূল কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়। এগুলির মাধ্যমে **নতুন নতুন ভূখণ্ডে খ্রিস্টীয় আধিপত্য বিস্তৃত হতে লাগল,** খ্রিস্টীয় রাষ্ট্রগুলি শেষ অবধি জগতে স্বীকৃতি পেতে শুরু করল। এতদিন প্রাচ্য (Orient) ছিল এক সুরক্ষিত দুর্গের মতো। ইউরোপীয় আক্রমণ কৌশলের সামনে হঠাৎ যেন প্রাচ্যের সব প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। মুসলিম ও বৌদ্ধ সমাজ পড়ে রইল পিছনে, তাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐতিহ্যও গুরুত্ব হারাল। **মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক পালাবদল ঘটল,** ভূগোলে যার তাৎপর্য খুবই গভীর। এর পর থেকেই **ভূগোলচর্চায় ইউরোপ ও আমেরিকার গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেল;** পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গিও হয়ে উঠল **ইউরোপ-কেন্দ্রিক** (Eurocentric)।

ডাডলি স্ট্যাম্প (Dadley Stamp) তাঁর 'ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ' বইটির গোড়াতেই অবস্থান বিষয়ে লিখতে গিয়ে এর এক সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন আবিষ্কারের যুগের আগে ও পরে ব্রিটেনের অবস্থান তদানীন্তন যুগের মানুষদের চোখে কিভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। আবিষ্কারগুলির আগে পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর ছিল প্রকৃত অর্থেই জানা-পৃথিবীর (the known world) কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং ব্রিটেন ছিল এই পৃথিবীর প্রান্তদেশে (periphery)। কেন্দ্রিক (central) অবস্থানের চেয়ে প্রান্তিক (marginal) অবস্থানের গুরুত্ব স্বভাবতই কম; ব্রিটেন তাই তখন মানব সভ্যতার মূল বিন্দুতে ছিল না। আবিষ্কারগুলির পরে যখন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এই 'জানা-পৃথিবীর' অন্তর্গত হল, আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীর পরিসরটা যেন অনেকখানি বেড়ে গেল। আর **ব্রিটেন হয়ে উঠল এই সুবিশাল পৃথিবীর মধ্যমণি,** একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত, যার একদিকে ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা অর্থাৎ **পুরনো বিশ্ব** (the old world) আর অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা অর্থাৎ **নতুন বিশ্ব** (the new world)। এর ফলে **ব্রিটেনের অবস্থানের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গেল।**

এই আবিষ্কারগুলির ফলে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে **পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বাড়তে থাকল।** 1590 সালে **ভূসর্বেক্ষণ** (surveying)-এর জন্য **প্লেন টেবিল** (plane table) যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। **গ্যালিলেও** (Galileo) 1609 সালে দূরবীন যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। জমি-জরিপের জন্য **ত্রিভুজীকরণের** (triangulation) প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছিল 1610 সালে। নৌ-অভিযানগুলির কালে যেসব অসুবিধের সম্মুখীন হতে হত, সেসব সমস্যাগুলি দূর করতে গিয়ে **মানচিত্রবিদ্যা** (Cartography) ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকল। **এডমন্ড হ্যালি** (Edmund Halley), যাঁর নামে হ্যালির ধূমকেতু, 1699-1700 সালে এক সমুদ্রযাত্রার সময়ে লক্ষ্য করলেন তাঁর আঁকা পৃথিবীর সমোষ্ণরেখার মানচিত্রে (isothermic map) **চৌম্বকীয় তারতম্য** (magnetic variation) ঘটছে। তিনিই প্রথম মন্তব্য করেন যে সমস্ত দ্রাঘিমারেখায় এই তারতম্যের পরিমাণ এক নয়। সূর্যের উচ্চতা মাপার (measurement of the sun's altitude) জন্য ষোড়শ শতাব্দীতে উদ্ভাসিত হল **ক্রস-স্টাফ** (cross-staff)।

Scanned with CamScanner

1731 খ্রিস্টাব্দে উদ্ভাবিত হল **অকট্যান্ট** (octant), এবং পরের বছরে দেখা দিল এটিরই পরিমার্জিত রূপ, **সেক্সট্যান্ট** (sextant)। এখনও পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রায় এটি ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রে চলার সময়ে গতি পরিমাপের জন্য ব্রিটিশ নাবিকেরা উদ্ভাবন করলেন **লগ** (log) **রাখার পদ্ধতি**। তার ফলে ভূপৃষ্ঠের যে কোনও স্থানের অবস্থান, দিক ও দূরত্ব নির্ধারণ করা সহজ হয়ে উঠল এবং অক্ষাংশ নির্ধারিত হতে থাকল। এসব উদ্ভাবনের ফলে **সমুদ্রযাত্রায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটল,** ফলে বিশাল মহাসাগরগুলির সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছতর হতে শুরু করল।

সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় সঠিক দ্রাঘিমাগত অবস্থান এবং সময়ের জ্ঞান প্রয়োজন। এই সমস্যা মেটাতে **জন হ্যারিসন** (John Harrison) নামে এক ব্রিটিশ নাবিক 1714 সালে **পেন্ডুলাম ঘড়ি** (pendulum clock) তৈরি করলেন যা সমুদ্রেও ব্যবহার করা যায়। এর মধ্যেই ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডে এধরনের ঘড়ি নির্মিত হতে শুরু হয়েছে।

আবিষ্কারের যুগের প্রধান ফল **মানচিত্রবিদ্যায়** (Cartography) **বিপুল উন্নতি**। পুরাতন যুগের মানচিত্রকারদের ভুলগুলি সংশোধন করার প্রয়োজন অনুভূত হল। ফলে নতুন ম্যাপ আঁকা শুরু হল। এসব ম্যাপ ছিল অনেক তথ্যপূর্ণ ও সঠিক। টলেমির ঐতিহ্য ভেঙে **ফ্রা মাউরো** 1459 সালে প্রথম তাঁর মানচিত্রে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ দিকটি খোলা দেখিয়েছিলেন। মানচিত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্র ছিল **ভেনিস ও জেনোয়া**। টলেমির প্রাচীন ভ্রান্ত ধারণা, ভূমিখণ্ডগুলিকে ঘিরে আছে সমুদ্র, তা একদিনে সংশোধিত হয়নি। এযুগের **মার্টিন বেহাইম** (Martin Behaim), **জুয়ান দ্য লা কোহা** (Juan de la Cosa), **মার্টিন ওল্ডসীমুলার** (Martin Woldseemuller—যিনি 1507 সালে প্রথম ম্যাপে 'আমেরিকা' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং তাকে পৃথক মহাদেশ হিসাবে অঙ্কন করেন) **পিটার এপিয়ান** (Peter Apian), **জেরারডাস মার্কেটর** (Gerardus Mercator—যিনি 'মার্কেটরের প্রজেকশন' উদ্ভাবনের জন্য বিখ্যাত), **আব্রাহাম ওরটেলিয়াস** (Abraham Ortellius), **নিকোলাস সসোঁ** (Nicholas Sauson) প্রভৃতি মানচিত্র প্রস্তুতকারকের নাম উল্লেখযোগ্য।

1768 থেকে 1779 সালের মধ্যে সম্ভবত **ভূগোলের চিন্তাধারায় সবচেয়ে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে**। টলেমির লেখা 'জিওগ্রাফিয়া' বইটি ল্যাটিনে অনূদিত হবার পর থেকে খ্রিস্টীয় জগতের বিশ্বাস ছিল যে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণভাগকে ঘিরে আছে বিরাট এক মহাদেশ, 'অজানা দক্ষিণ ভূখণ্ড' (Terra Australis Incognita)। আরব ভৌগোলিকেরা এধরনের কোনও ভূখণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি, ফ্রা মাউরোর মানচিত্রেও এটি দেখানো হয়নি। 1768 খ্রিস্টাব্দ থেকে **ক্যাপ্টেন কুক** (Captain Cook) ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশগুলিতে ভ্রমণ করতে থাকেন এবং 71° দক্ষিণ অক্ষাংশেরও দক্ষিণে পৌঁছে এধরনের কোনও মহাদেশ খুঁজে না পেয়ে খ্রিস্টীয় জগতের একটি **প্রধান ভৌগোলিক ভ্রান্তি দূর করেন**। তাঁর সমুদ্রযাত্রায় **ক্যাপ্টেন কুক আবিষ্কার করেন বহু দ্বীপ, এবং অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ দুটির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন।**

পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা ছিল বিশ্বজগতের কেন্দ্রে আছে পৃথিবী; একেই **ভূকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গি** (Geocentric approach to the universe) বলা হয়।

Scanned with CamScanner

1497 থেকে 1529 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পোল্যান্ডের পণ্ডিত **নিকোলাস কোপারনিকাস** (Nicholus Copernicus) এই মত প্রতিষ্ঠিত করেন যে **সমস্ত গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।** 1618 সালে **কেপলার** (Kepler) প্রমাণ করেন যে বৃত্তাকার পথে নয়, গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিকে ঘোরে **উপবৃত্তাকার** (elliptical) পথে। কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক (helio-centric) মতের **সমর্থনে গ্যালিলেও** (Galileo) 1623 খ্রিস্টাব্দে প্রমাণ দাখিল করেন ও খ্রিস্টীয় গির্জাগুলির পুরোহিতদের বিরাগভাজন হন। 1686 খ্রিস্টাব্দে **আইজ্যাক নিউটন** (Isaac Newton) তাঁর **মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব** (laws of gravitation) উপস্থাপিত করেন।

এসকল নতুন আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও তত্ত্বের মাধ্যমে ইউরোপের মানসজগতে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় যাকে অনেকে **বৈজ্ঞানিক বিপ্লব** (scientific revolution) আখ্যা দেন। শুধু বিজ্ঞান নয়, ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতিতেও মধ্যযুগের অন্ধকার কাটতে থাকে, দেখা দেয় **নবজাগরণ** বা **রেনেসাঁ** (Renaissance)। অতএব, রেনেসাঁ-পূর্বযুগকে বলা চলে বিখ্যাত মেধা বিপ্লব (great intellectual revolution)-এর যুগ যার বৈশিষ্ট্য হল ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যৎবাণী। এই সময়েই **জ্ঞানের বিশেষায়ণ** (specialization of knowledge) শুরু হতে থাকে ঃ **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান** (physical science), **জীবন বিজ্ঞান** (biological science), ও **সমাজ বিজ্ঞান** (social science)—এই তিনটি শাখার অন্তর্ভুক্ত হতে থাকেন পণ্ডিতেরা। **ছাপাই যন্ত্র** (printing machine) উদ্ভাবনের ফলে বই প্রকাশিত হয়, সাধারণের কাছে পৌঁছাতে থাকে অ-সাধারণ ভৌগোলিক জ্ঞান। এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ফলেই পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে ভূগোলের যাত্রা শুরু হয়।

Scanned with CamScanner

SHUBHRA CHANDRA
DEPT. OF GEOGRAPHY
SEMESTER – IV
PAPER – C 8T
REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT.
UNIT I : REGIONAL PLANNING
(I.) CONCEPT OF REGION AND DELINEATION

Region and Regionalization

THE CONCEPT OF REGION

It is very difficult to define a region because the concept has been used by different people to mean different things. The concept is generally linked with 'space' and has spatial dimensions, though it is sometimes also used as something 'subjective' (a 'mental construct') or 'spaceless'. The followers of the subjective approach treat region only as an 'idea' by accepting the nation as a one-point economy, and arbitrarily dividing it into as many regions as the need be, independent of considerations of space. This concept is favoured by many economists engaged in the formulation of regional growth theory. However, for most geographers and public in general, region is an objective reality linked with space and defined in terms of (and through) space. The major problem that has to be faced in such an analysis is the ambiguity that surrounds the term 'region'. Thus, sometimes part of a district (sometimes even a village) is called a region, sometimes a district is taken to be a region, sometimes a State and sometimes a group of States (or parts of them) is regarded as a region. In international trade and in discussions relating to international economic relations it is not infrequent to find a combination of nations as constituting a region. However, if one states clearly the object of one's enquiry the confusion can be considerably reduced, for depending on the purpose of one's enquiry the definition (or more accurately, the delimitation) of region will vary. As far as the methods of delimiting a region are concerned they can be grouped under three categories: homogeneity, nodality, and programming. "The first stresses *homogeneity* with reference to some one or combination of physical, economic, social or other characteristics; the second emphasizes the so-called *nodality* or *polarization*, usually around some central urban place; and the third is *programming* or *policy-oriented* concerned mainly with administrative coherence or identity between the area being studied and available political

Scanned with CamScanner

institutions for effectuating policy decisions."[1] However, as noted by Meyer, the three categories are not mutually exclusive. Thus, "a so-called programme or policy region is essentially homogeneous in being entirely under the jurisdiction of some one or a few specific government or administrative agencies". Similarly, "a nodal region is homogeneous in that it combines areas dependent in some trade or functional sense on a specific centre".[2]

This similarity should not be stretched too far since basically the idea of homogeneity emphasizes *uniformity* while the idea of nodality underlines *interdependence*. The one gives a *formal region* and the other a *functional region*. A formal region is a geographical area which is homogeneous in terms of selected geographic criteria (as similar topography or cilmate), or selected economic criteria (such as similar per capita income levels, similar production structures, similar consumption patterns, uniform unemployment situation, etc.), or social and/or political criteria (e.g., party allegiance). When physical homogeneity is stressed, i.e. when uniformity in topography or climate is taken into account in actual delineation of regions, we get the oft-discussed *natural regions* or *physical-geographic* (*or physiographic*) *regions*. When we stress economic homogeneity, i.e. when we emphasize uniformity or similarity in per capita income levels, production structure, consumption pattern, etc., we get *economic regions*. When homogeneity in some social factor(s) is stressed, we get what are generally called *socio-cultural regions*. Against all such classifications, the *functional region* emphasizes interdependence (or linkage). It is composed of heterogeneous units such as cities, towns, and villages which are nevertheless functionally interrelated. Obviously, the functional region is a nodal region since it emphasizes intra-regional spatial differentiation. Population and economic activities are seen as concentrated in or round some specific foci of activities (e.g., large urban centres). The functional interrelationships are usually revealed in *flows* of people, factors, services, commodities, or communications.

PLANNING REGIONS

When one comes to defining regions for planning purposes, administrative convenience assumes paramount importance. This is so because in actual implementation of development plans, the existing administrative boundaries cannot be easily ignored. In fact, it is generally these boundaries that have to be accepted as demarcating the different regions. Political realities and availability of data for specific administrative units only make this practically essential.[3] However, in the enthusiasm of practical (administrative) considerations, one must not forget the importance of the factors of

Scanned with CamScanner

DELINEATION OF FORMAL REGIONS

As already noted, in the delineation of formal regions we seek to find out similarities, homogeneity, and uniformity in localities on the basis of a specific criterion (or a set of criteria). The localities possessing homogeneity are classified as constituting one region.[10] We have also emphasized that the criterion (or criteria) may relate to the physical geography, economic structure, or socio-cultural factors. The economic criterion that is most often used is 'per capita income level' and this is combined with some other criteria to introduce more sophistication and realism into the analysis. The simplest case will, of course, be that in which we consider per capita income only. For purposes of illustration, let us suppose that a and b are two localities with per capita incomes Y_a and Y_b respectively. The simplest procedure would be to classify a and b in the same region if $Y_a = Y_b$. Alternatively, we may include a and b in the same region if $Y_a - Y_b$ is small. Thus, we can prescribe certain definite limits for this purpose so that if $Y_a - Y_b$ is less than the limits, a and b are included in the same

Scanned with CamScanner

region, and if $Y_a - Y_b$ is greater than the prescribed limit (or level), *a* and *b* fall in different regions. Another method is to test whether the difference between Y_a and Y_b is significant with the help of statistical methods of testing of significance.

Problems arise when we try to delineate regions by taking into account more than one feature (especially if they are incommensurable such as per capita income, literacy, industrialization, etc.). The issue of assigning weights to the different features has also to be faced. The methods that can be adopted in such a case are basically three: (i) the fixed index method, (ii) the variable index method, and (iii) the cluster method. Under the fixed index method, a number of characteristics (indices) common to regions are chosen; e.g. per capita income, unemployment, rate of industrialization. An arbitrary weight is given to each index and a single weighted mean is obtained for each region. Then contiguous regions, with similar indices, are grouped together in order to minimize the variance within each group. Under the variable index method, variable weights are assigned to highlight different *levels* of activities in different regions. The weight given to each activity, in each region, is different and in accordance with the *value* or the *volume* regionally produced. For example, if region *A* is a wheat region and region *B* is a coal region, the weight of wheat index will be the largest in the former and the weight of coal index will be the largest in the latter. This method is good when the criteria can be compared with each other. However, in those cases where comparability is not possible (e.g., in the case when one feature is *literacy* and the other is *steel production*), it becomes necessary to employ the cluster method. The cluster method is used to detect the homogeneous character of the structures of different regional units. For this purpose, a study of the income and trade flows can be made. Such a study is resorted to while delineating functional regions (or polarized regions) also, but whereas in the former case we consider income and trade flows for the purpose of comparison only, in the latter we study the *linkage processes*.[11]

For tracing the clusters, we can take the help of mapping techniques wherein interrelated variables are mapped by superposing techniques. The regional divisions identified by Spate and Learmonth were obtained by superimposition of many individuals' multivariate studies on different parts of India and Pakistan, and the study on 'Resource Development Regions' couducted by V. Nath for the Planning Commission was based on multivariate superposition of natural and physical resources in India.[12] However, "when the variables are too many, particularly when they are not having strong interrelations, the mapping by superposing techniques is not much help in the identification of composite formal configuration, since the combinations of different classes of all variables that include one or more areal units become numerous. Again, it is possible to identify the differential levels between areas only through the ranks of areas in individual variables,

Scanned with CamScanner

but the composite ranking of areas with reference to all variables that are superimposed together to identify a composite formal configuration is very difficult."[13] Because of these reasons, it is essential to employ certain quantitative techniques also in addition to mapping techniques. In the application of such techniques, there are several possibilities. In those cases where many interdependent variables are involved two possibilities arise: (i) variables are interdependent having a particular order in them, with or without any causal relation among them, or (ii) all variables are simultaneously interdependent without the existence of any order among them. Examples of the first kind with two variables can be seen in the study pertaining to 'An Atlas of Resources of Mysore State' conducted under the supervision of A.T.A. Learmonth (1960). Pairs of such ordered variables are: "(i) the normal rainfall together with the temporal variability (coefficient of variation) as an inverse measure of reliability of the normal rainfall, or (ii) the exponential rate of population growth together with the deviation of actual to exponential population curves as an inverse measure of stability of the rate of population growth, or (iii) the mean morbidity rate of a disease together with the variability as a measure of the epidemic or endemic nature of the disease, etc."[14]

In the case of simultaneously interdependent variables of equal importance (where the identity of individual variables is not important), Pal advocated the use of a composite index of development.[15] In the case of simultaneously interdependent variables of varying importance, integration of all variables of development can be done either by the subjective or by the objective methods with or without weighting for the differential importance of constituent variables. In the subjective method, the "geographers usually apply the technique of superimposition of varieties of both commensurable and non-commensurable information obtained through field experiences, opinion surveys, and on the basis of available quantitative and non-quantitative data. This mode differentiating areas is not according to any strict quantitative formulation and as such the ranking of each area in comparison with all others, that may be needed in evolving the norms for decision-making, is not possible even though the areas could be differentiated qualitatively."[16] An attempt on these lines was made by Schwartzberg (1962) to delineate the different areas of India for grades of development and sought to give credibility to his analysis by carrying out opinion surveys from selected Indian economists and geographers.

An unweighted aggregation study to obtain a composite development index for ranking Indian districts was used by Asok Mitra using the 1961 census data. (Mitra's method is discussed in detail in Chapter 5.) When one comes to weighted aggregates, the weights can be either subjective or objective. Subjective weighting was used by Schwartzberg (in the way pointed out above) to determine the development ranks of 18 old Indian States.

Scanned with CamScanner

Objective weighting method was used by the National Council of Applied Economic Research in estimating the per capita income of districts (1963) using 'price-weighted aggregation of economic activities of production and services'.

In a situation when we are to handle a group of heterogeneous variables that could be considered as to influence or be influenced by several characteristics or sub-characteristics, the technique employed for delineation of regions is known as the *principal component analysis*. This method was first employed by M.J. Hagood in 1943 to delineate regions of relatively greater homogeneity. In Indian conditions, M.N. Pal popularized the use of this technique after Hagood. The question that is sought to be answered relates to the assigning of weights to selected economic (development) indicators since, as we have tried to illustrate so far, this is the basic question in formulating any composite index of development. The guiding principle in the principal component analysis for determining individual or group indicator weights is the inter-correlation among them, high weights being assigned to those showing high inter-correlation and vice-versa. "The logic for applying this principle seems to rest on the view that the development process is propelled by the joint action of a number of inter-related variables and that, therefore, stronger the relationship between a set of indicators, the more important they are to development. Implicit in this logic is the notion of balanced growth and perhaps even more significantly, the insistence that only balanced growth is indicative of development."[17]

IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL REGIONS

Delineation of formal regions on the basis of homogeneity considerations carried out in terms of either simple or composite characteristics (discussed above) is undoubtedly a useful method in regional planning and is necessary in those cases where regional differentials are important in planning policies. However, it is, in itself, incomplete because in it considerations of spatial interdependence are lost sight of. Therefore, "the next step is to identify what can be called the functional spatial configurations wherein the inter-dependence between diverse formal areas or localities is ascertained for one or more selected phenomena of spatial flows. Such interdependencies are usually so patterned as to form functionally organized units in the spatial configuration, with varying centripetal intensities of spatial flows in each such unit called functional regions. Major centres of different functional regions in the spatial configuration can again be linked axially (not centripetally) on the basis of macro-economic functional ties."[18] The techniques usually employed in actual delineation of functional regions are (i) the flow analysis and (ii) the gravitational analysis.

Scanned with CamScanner

The *flow analysis* is based on an *empirical study* of flow data which may refer to different forms of spatial flows such as: intra-regional (i.e. within the region) commodity flows; commuting patterns and migration flows (to study movements of people); distribution area of retail and household goods and their relative traffic over different parts of the trade area; freight and passenger movement; telephone communication densities; newspaper circulation area; financial intra-regional ties; area served by centrally located social services and leisure facilities; journey work patterns; etc. Each flow will show a decreasing intensity as it becomes more distant from the main centre, and an increasing intensity as it approaches another centre. The boundary of area of influence (of the area being considered) will be where the flow intensity, reaches the minimum. To highlight the spatial flows, it is usual to construct flow maps since they are in a better position to illustrate actual lines or routes of flows while a tabular presentation 'does not say anything about the depth along different routes of flows'. However, the basic flaw in flow mappings is that they do not give the full story on account of *information gaps* in flow data (which are present in practically all countries but are present in a very serious form in underdeveloped countries). Therefore, it becomes necessary to undertake what is known as the *gravitational analysis*.

Gravitational Analysis: Under this analysis we study the theoretical forces of attraction between centres instead of actual flows as under the flow analysis. The importance of this technique is clear from the fact that it is an important instrument to study the *potential flows* between centres.

Stated in simple terms, the gravity principle merely states that the interaction between two geographical points or areas is directly related to their 'masses' and inversely related to the 'distance' between them. Both the terms 'mass' and 'distance' are, however, difficult to define and many controversies have arisen on this account. For example, 'mass' may be regarded as population or as employment or as income or as retail turnover or as economic activity of one type or the other (however measured); the distance may refer to road distance, airline distance, time distance, money distance, etc. Once mass and distance are defined (depending on the purpose of the study or the value judgement of the researcher), the gravitational force between two centres i and j is expressed as

$$G_{ij}=K\left[\frac{M_iM_j}{d_{ij}^2}\right] \qquad \text{(i)}$$

where G_{ij} represents the gravitational force between centres i and j, M_i and M_j represent the masses of the centres i and j, d_{ij} is the distance between them, and K is a constant.

Scanned with CamScanner

SHUBHRA CHANDRA
DEPT. OF GEOGRAPHY

SEMESTER - IV

PAPER – C8T

REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT

UNIT - I - Regional Planning

(2.) Types of Planning, principles and objectives of regional planning

WHAT IS PLANNING?

But the question is: 'What is planning?' Though the term planning is generally understood to imply some sort of regimentation, regulation, and *guided direction* of economy and other activities of a country to develop the economy, it is necessary to define it precisely before we proceed further. According to the Planning Commission of India, "Planning involves the acceptance of a clearly defined system of objectives in terms of which to frame overall policies. It also involves the formation of a strategy for promoting the realisation of ends defined. Planning is essentially an attempt at working out a rational solution of problems, an attempt to coordinate means and ends; it is thus different from the traditional hit-and-miss methods by which reforms and reconstruction are often undertaken."[15] Perhaps the best definition is given by H.D. Dickinson, according to which, economic planning is "the making of major economic decisions—what and how much is to be produced and to whom it is to be allocated by the conscious decision of a determinate authority, on the basis of a comprehensive survey of the economic system as a whole".[16] This definition highlights three features of economic planning: (i) it involves making of major economic decisions, (ii) such decisions are to be made consciously (on the basis of some objectives that are generally taken as given), and (iii) the decisions are to be made by a certain determinate authority on the basis of a survey of

Scanned with CamScanner

the economy as a whole.

There are, however, at least two points that are not specifically included in the above definition—one relates to the 'notion of balance or consistency' and the other to the 'notion of optimization'. The notion of balance or consistency implies "taking proper account of the inter-connections and mutual repurcussions of the different elements of a composite system of action" and the notion of optimization implies "attaining the objectives at the least 'cost' in terms of time or effort or money".[17] If we neglect the notion of consistency, we might find ourselves in a situation where policies adopted to achieve a certain defined objective are mutually conflicting and contradictory. If we neglect the notion of optimization, we might be led to a situation where the objective is fulfilled after an unduly long effort in terms of time and money (while shorter methods existed but were not utilized).

CONSTITUENTS OF A PLAN

From the above discussion, it is possible to indicate the constituents of a plan:

(i) *Problem Identification:* Based upon the tasks which the planning process is expected to fulfill, the planners must identify the problems explicitly and, on that basis, specify a *set of objectives.*

(ii) After the objectives have been accepted, the planners should proceed to decide how they can be achieved. Since resources are scarce it becomes necessary to fix priorities. In general, the priorities are determined in such a way that the objectives can be realized in the *minimum possible time.* This is done by studying the alternative plan models and selecting the one that is expected to achieve the objectives in the minimum possible time or by devising a new model. The model selected should satisfy at least three criteria. "One criterion is *contingency.* There must be a clear relationship between the reality of the problem situation and the variables in the theoretical model. Another criterion is *consistency:* The postulated relationships within the model must not be contradictory. A third criterion is *completeness.* All key parameters that define the problem situation and in terms of which a solution can be operationally identified must be included."[18]

(iii) After the priorities have been determined, the least-cost method of carrying them out should be determined.

(iv) After this stage comes the actual process of implementation of the plan. For this purpose the phyical and financial aspects of the plan have

Scanned with CamScanner

to be integrated and the public administration geared to carry out the implementation.

(v) The last stage involves the provision for a continuous evaluation of the implementation programme. A continuous evaluation is necessary to determine whether the implementation of the plan is being carried out according to the strategy laid down.

REGIONAL PLANNING

As noted in the section on regional economics, interest in this field of study emanates from the fact that 'the element of space has become one of the key economic factors' and there is a growing concern among economists (and all other social scientists) to ensure *optimal utilization* of space and *optimal distribution pattern* of human activities. Regional planning is the instrument through which such optimality is sought to be brought about. In countries where the crucial questions regarding the size, the pattern, and the place of investment are determined by sectoral units under the overall supervision of national planning authorities, the role of regional planning is *passive* and is reduced to the following activities:

— to register the distribution of investment decisions made by the sectoral units;
— to analyse the impact of the decisions on the development of different regions in a given country;
— to indicate how the sectoral investment decisions can be integrated at the regional level and what advantages can be achieved by the integration.[19]

In such a framework, regional planning is only an 'instrument to improve the sectoral efficiency of the investment processes'. In those countries where the basic objectives of regional development are incorporated in the national plans, regional planning assumes a more positive and *active* role. Questions such as 'what is where and why—and so what' are decided with the help of regional economics and on the basis of this knowledge, regional planners seek to (i) improve the distribution pattern of human activity, and (ii) reduce the disparities between the rich and the poor regions of the country.[20]

Like planning at the national level, regional planning also has the objective of accelerating the processes of social advancement of the community through the techniques of economic (and social) planning though the sphere of influence of a regional plan is restricted to the given region or area of

Scanned with CamScanner

the country. Within the overall framework of a national plan, regional planning is designed to formulate measures to assist the growth of certain regions while restraining the growth of others (if that becomes necessary), assist the governments in examining the regional implications of undertaking infrastructural developments, and lay down detailed plans for economic activity in the different regions of the country. In the initial stages of its development in the 1930s, regional planning was generally understood to mean natural resource planning, and thus its role was confined to determining the ways and means of developing the natural resources of a region. Classsic examples of this belief were the TVA (Tennessee Valley Authority) and the regional planning studies of the Natural Resources Planning Board in the USA.

However, with the passage of time, the emphasis on natural resource planning reduced considerably as new dimensions of urban and metropolitan planning, environmental planning, human resource and community planning, planning for problem areas, etc., considerably enlarged the scope and content of regional planning. The emphasis on economic and social aspects in the writings of Ian Burton, James Henderson, Harvey Perloff, Edward Hearle, and others brought to the fore the problems of economic and social development, provision of education and social services, and equitable distribution of income and wealth. The inclusion of this spectrum of problems has made the concept of regional planning so comprehensive as to embrace all economic and social behaviour in a given region.[21]

METROPOLITAN AND URBAN PLANNING

In the developed countries, this element of regional planning is now receiving most of the attention of regional planners so much so that there is a distinct tendency in those countries to regard it as the whole of regional planning. In fact, John Friedmann assigns the entire field of regional planning in the USA to the planning of metropolitan complexes, as the definition of regional planning proposed by him proves. "Regional planning," according to him, "is the process of formulating and clarifying social objectives in the ordering of activities in supra-urban space."[22] This definition, says Friedmann, provides a 'link' with city planning which is concerned with the organization of intra-urban space. The two approaches meet and merge in the metropolitan region in whose context "the task of the regional planner will be to state the ordering of control centres within the area, to identify the functions to be performed by each centre, and to study the inter-regional effects of the expansion of metropolitan

Scanned with CamScanner

APPROACHES TO REGIONAL PLANNING

The approach to regional planning can be either 'total' or 'selective'. In the total regional planning approach an attempt is made to develop all regions of an economy, while in the selective approach the attention is concentrated on the development of some regions only. However, this differentiation between the 'total' and 'selective' approaches is possible only in the context of an economy where no national planning exists. In most of the under-developed countries, there is some sort of planning for all regions, at least in the overall framework of a national plan. Under these circumstances, it is better to define the total regional planning approach as the one which aims at *equal development rates* for all regions of the economy by providing equal investment in all of them. The selective regional planning approach will then be one that aims at *unequal development rates* for the different regions of the economy by providing unequal investments in them. When we talk of equal investment, we mean equal investment in relation to the size of the region (size can be determined in relation to either area or population or both). Thus, if region 1 is double the size of region 2, it receives investment twice as much compared with region 2. This is necessary, for otherwise equal investment will, in fact, imply unequal investments, as is fairly obvious. For example, if regions 1 and 2 receive the same investment, it clearly amounts to discrimination in favour of region 2.

As for the choice between the total regional planning approach and the selective regional planning approach, it is easy to see that the resources required by the former in terms of funds, physical resources, entrepreneurial and managerial skills, technical capabilities, etc., will be beyond the reach of an underdeveloped country. Therefore, an underdeveloped country has, of necessity, to rely on the selective approach in its regional planning

Scanned with CamScanner

strategy. Under such an approach it will devote more resources to the development of some regions and less resources to the development of others.

The advantages of the selective approach are many: (a) different kinds of regions for different purposes can be designated; (b) a loose delineation of regional boundaries can be adopted so that they can be changed whenever required (this introduces an element of flexibility in the planning process); (c) the regional effort can be dropped when the purpose has been largely accomplished; and (d) fewer planning personnel and organizational resources are required, and the available ones can be shifted from region to region as situations change.[35]

According to Perloff, the selection of a region for special attention will, in general, be guided by the following factors:

1. The possibility of developing an outstanding untapped resource, either of a limited type, such as a multi-purpose river basin development, or of a broad type involving a large spectrum of activities. . . .
2. The solution to a severe and nationally threatening problem, such as an extremely depressed area, a culturally backward area not in the national mainstream, or an area threatening to break away politically.
3. A combination of both significant potentials and tough problems, such as the planning of major metropolitan regions.[36]

Through the adoption of the selective approach, a country can concentrate more on the lagging regions and help them develop at a faster rate than other regions. As a consequence of this policy, employment opportunities will expand in the backward regions, per capita income will increase, and the incentive to migrate to prosperous regions will decline. This will also be to the advantage of the prosperous regions in the long run.

REGIONAL vs. NATIONAL PLANNING

There is a tendency in some quarters to think of *regional* as something opposed to *national*. The term 'regional' is often understood to imply a sectarian outlook and is consequently taken as a hurdle in the task of national integration. This belief is strengthened by the frequent clashes and conflicts between the regional and national authorities on the allocation of investment and other resources. Besides these practical problems, it is possible to think of situations where there are conflicts between national and regional goals on theoretical reasoning as well. Because the regions of an economy differ from one another in regard to their physical conditions and

Scanned with CamScanner